OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 100
Website: https://tirj.org.in, Page No. 883 - 901
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 883 - 901
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

মিথ, ইতিহাস ও ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের আলোকে শ্মশান - শ্মশান সঙ্গীত ও সাহিত্য : অন্ত্যজ মানুষের জীবনদর্শন

ড. অজয় কুমার দাস
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়
চৈতন্যপুর, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর
Email ID : ajoy.003@rediffmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
শ্মশান, মনুসংহিতা, চণ্ডাল, শিব, এইচ. এইচ. রিসলে, শ্মশানসঙ্গীত, চর্যাপদ, মোক্ষ, অনাথ শব, সতীদাহ, রবীন্দ্রনাথ।

Abstract

'শিবপুরাণম' গ্রন্থে উল্লিখিত দেবাদিদেব মহেশ্বরের প্রিয়তম স্থান শ্মশানভূমি। শ্মশান মানুষের অন্তিম বাসস্থান। ভূত-প্রেত, শৃগাল-শকুন, মৃতের মস্তিষ্ক, হাড়-গোড়ে বড়ই দুর্গম এই স্থান। শিবপত্নী পার্বতীও স্বামীর মতই শ্মশানে-মশানে ফেরেন। শ্মশানের মধ্য দিয়েই মোক্ষ ও মুক্তি পিপাসু হিন্দু স্বর্গগমন করেন। সংসারের বন্ধন থেকে মানুষ মুক্তিলাভ করেন। শ্মশান বন্ধুরা মৃত স্বজনের স্বর্গযাত্রার পথ সুগম করার জন্য দেবতার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করেন। গঙ্গাতীর শ্মশানভূমির উপযুক্ত স্থান। গঙ্গার স্পর্শে পাপ বিনষ্ট হয়। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র নিম্নবর্গীয় অন্ত্যজ চণ্ডাল সম্প্রদায়কে শ্মশান রক্ষার দায়িত্ব সমর্পণ করেছেন। মহর্ষি মনু অন্ত্যজ চণ্ডাল সম্প্রদায়কে মনুষ্যজাতির অধম বলে বর্ণনা করেছেন। নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবনদর্শনের প্রকাশ ঘটেছে শ্মশানসঙ্গীতে। এমন সঙ্গীতে মানব জীবনের অসারতা প্রতিফলিত। কেমন আছেন শ্মশান চণ্ডালেরা? না তারা ভালো নেই। বাংলা সাহিত্যে শ্মশান বিচিত্র রূপে উপস্থাপিত। চর্যাপদের ৫০ সংখ্যক পদে শ্মশানের উল্লেখ আছে। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে 'চাণ্ডাল' শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে নদী তীরবর্তী শ্মশানভূমির উল্লেখ আছে। হিন্দুরা মৃতদেহকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলেন। হিন্দু বৈষ্ণবেরা মৃতদেহকে মাটিতে সমাধিস্থ করেন। রামায়ণ মহাভারতের কালে চিতায় মৃতদেহের দাহকার্য সম্পন্ন করা হত। মাদ্রী পাণ্ডুর সঙ্গে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত চিতাতেই অনুমৃতা হয়েছিলেন। দেবীভাগবত পুরাণে উল্লিখিত আছে, ঋষি বিশ্বামিত্রের অভিশাপে রাজা হরিশ্চন্দ্র কাশীর মহাশ্মশানে চণ্ডালের কাজ করেছিলেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেবদাস' উপন্যাসে দেবদাস অনাথ শব রূপেই পরিগণিত। কমলকুমার মজুমদারের 'অন্তর্জলী যাত্রা' উপন্যাসে শ্মশান চণ্ডাল হলেন বৈজু। শরৎচন্দ্রের 'অভাগীর স্বর্গ', 'শ্রীকান্ত' প্রভৃতি উপন্যাসে শ্মশানের উল্লেখ আছে। রবীন্দ্রনাথের 'বনফুল' কাব্যগ্রন্থে 'শ্মশান' নামের একটি সুদীর্ঘ কবিতা রয়েছে। মধুসূদন দত্ত তাঁর 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র 'শ্মশান' কবিতায় পাঠককে বিষণ্ণতার সামসঙ্গীত উপহার দিয়েছেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 100
Website: https://tirj.org.in, Page No. 883 - 901
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সংস্কার, সতীদাহ প্রথা প্রভৃতি শ্মশানকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। শ্মশানসঙ্গীত হয়ে উঠেছে নিম্নবর্গীয় মৃত ব্যক্তির আত্ম প্রতিরূপ। শ্মশান ও মৃত্যু সমার্থক। মৃত্যুর স্থির সমুদ্রে জীবনের অর্জিত গৌরবরাশি বৃথা হয়ে যায়। অর্থ-সম্পদ-খ্যাতি-প্রতিপত্তি সবই যায়। শ্মশানের চিতার আগুনে ইহজগতের দেনাপাওনা সব চুকে যায়। শ্মশান কেন্দ্রিক সঙ্গীত ও সাহিত্য ভারতীয় জাতির গৌরব বৃদ্ধি করেছে।

Discussion

এক

"পুণ্যঞ্চ রমণীয়ঞ্চ সিদ্ধক্ষেত্রঞ্চ পার্ব্বতি।
ইষ্টং শ্মশানমেবং মে তত্র তত্র রমাম্যহম্।।
ইমে চাত্র গণাধ্যক্ষা রমণীয়ায়তেক্ষণে।
রময়ন্তি রমন্তো মাং শ্মশানং তেন মে মতম্।।
স তস্মিন পশ্যমানস্তু গুণাংশ্চ গুণবর্ণিনি।
স্নেহং সদা চ কুরুতে শ্মশানেহহমিবানবে।।" [১]

অতএব শ্মশানই আমার প্রিয়তম স্থান। পুণ্যরমণীয় এবং সিদ্ধক্ষেত্র স্বরূপ শ্মশানভূমিই আমার অভীপ্সিত। সেখানে অবস্থান করলে আমি অত্যন্ত সুখী হই। শ্মশানভূমি আমার ঐশ্বর্য স্বরূপ। সুতরাং এই স্থানকে আমি হিতকর বিবেচনা করি। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত 'শিবপুরাণম্' গ্রন্থে দেবাদিদেব মহেশ্বর তাঁর সহধর্মিণী পার্বতীকে একথা বলেছেন।

শ্মশান মানুষের অন্তিম বাসস্থান। শবদাহের ধোঁয়ায় মানুষের চোখ রক্তিম বর্ণ ধারণ করে। চিতার প্রজ্বলিত আগুনের লেলিহান শিখায় দিগবিদিক পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। পুরাণকার লিখেছেন -

"লোকনিষ্ঠাগৃহে চৈব শবধূমারুণেক্ষখণে।
চিতাশতসহস্রেষু প্রজ্বলিতে চিতানলে।।"[২]

এই সেই শ্মশান, যেখানে চিরনিদ্রায় শায়িত থাকেন মৃত ব্যক্তি। শ্মশানভূমি মৃত ব্যক্তির মাংসের গন্ধে পরিপূর্ণ থাকে। শ্মশান বড় ভয়ানক স্থান। ভূত প্রেতে পরিপূর্ণ। শৃগালের ভীষণ শব্দ। কাক ও পেচকে পরিব্যাপ্ত। নানাপ্রকার পাখি ও কুকুরের শব্দে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে শ্মশানভূমি। সর্বত্রই ভূতপ্রেতের অট্টহাস্য। শবের শরীরে পশুর দংশন ক্ষত চিহ্ন। শ্মশানের স্থানে স্থানে কুশ-কাশ প্রভৃতি দিয়ে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে পিণ্ড দেওয়া হয়। স্থানে স্থানে ব্রাহ্মণের যজ্ঞসূত্র পতিত রয়েছে। শৃগালের ধ্বনি। কখনো কখনো চিতার আগুন দুরন্ত হয়ে ওঠে। কোথাও পড়ে রয়েছে মৃতদেহের অপবিত্র খাট, পীঠক (খোন্তা), কুলা প্রভৃতি। কোথাও মৃতের বস্ত্র, আভরণ। কোথাও মৃতের চুল, কোথাও মস্তিষ্কের কাপড়, কোথাও ছিন্ন শিরোভূষণ শোভা পাচ্ছে। বড় বীভৎস, বড় দুর্গম এই স্থান। পুরাণকার লিখেছেন, এই সকল স্থান বড় ভয়ঙ্কর রৌদ্র, অদ্ভুত ও বীভৎস রসের লীলাভূমি। দুর্গম ও দুর্ধর্ষ -

"রৌদ্রেরদ্ভুতবীভৎসৈর্ভয়দৈঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
দুরন্তকালপ্রতিমে দুর্ব্বিগাহ্যে দুরাসদে।।"[৩]

শ্মশানকে দেবাদিদেব আশ্রয়স্থল রূপে গ্রহণ করলেন কেন? শ্মশানের চিতাভস্মে মানুষ মুক্তি লাভ করে। দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। ভূতিস্নানের (চিতাভস্ম) মত পুণ্য অর্জন আর কিছুতেই হয় না। আর এই ভূতিস্নানের কারণেই ভূত-প্রেত প্রভৃতি দেবাদিদেব মহেশ্বরের অনুচর হয়েছে। ভূতিস্নানের সুফল সম্পর্কে পুরাণে বলা হয়েছে, যেমন গঙ্গা সদৃশ তীর্থ নাই, বেদ সদৃশ শ্রুতি নাই, মৃত্যুর ন্যায় শাস্তা (শাসন, কর্তা, উপদেষ্টা) নাই, ঠিক তেমনি ভূতির মত তপস্যা নাই। 'দেবীভাগবতম্' – পুরাণে বলা হয়েছে, ভস্মধারণ করলে মানুষ শিবতুল্য হয় –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 100
Website: https://tirj.org.in, Page No. 883 - 901
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"বিভূতিধারণবিধিঃ স্মৃতিপ্রোক্তো ময়েরিতঃ।
যদীয়াচরণেনৈব শিবতুল্যো ন সংশয়ঃ।।"[৪]

এমনই শিবের প্রেমপাশে আবদ্ধ হয়ে পার্বতী তাঁর অনুমতিক্রমে শরীরার্দ্ধস্বরূপা হলেন। আর শঙ্কর হলেন অর্দ্ধনারীশ্বর। 'কালিকাপুরাণ' – গ্রন্থে উল্লিখিত আছে -

"ততোহতিম হতা প্রেম্না শঙ্করস্যাথ পার্ব্বতী।
শরীরমর্দ্ধমহরত্তস্যৈবানুমতে সতী।।"[৫]

'কালিকাপুরাণম্' - গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, দেবীর শরীরের একাংশ ব্যাঘ্রচর্ম ও ভূতিযুক্ত। অপরাংশ চন্দনসিক্ত ও বস্ত্র শোভিত। এরূপ শরীরের অর্ধভাগ স্ত্রীলক্ষণ, অপর অর্ধ সুদীর্ঘ পুরুষাকৃতি। শিবের অর্ধাঙ্গিনি পার্বতী স্বামীর মতই শ্মশানে – মশানে ফেরেন। সঙ্গে থাকেন পিশাচ-পিশাচী, ডাকিনী-যোগিনী। তান্ত্রিক সাধকেরা ডাকিনীর উপাসনা করেন। ভূত-প্রেতের অধিদেবতা হলেন শিব।

মোক্ষ ও মুক্তি পিপাসু হিন্দুরা জগতের অসারত্বের কথা বলেন। দেবীপদে তারা মুক্তির ঠিকানা খুঁজে নেন। মহাদেব স্বয়ং আত্মধ্যানের দ্বারা মহাজ্ঞান লাভ করেছেন। তিনি মহাযোগী। তিনি ধ্যানে দর্শন করেন। ব্রহ্মই প্রধান সার। ধর্ম দ্বিতীয় সারস্বরূপ। আর সমস্ত কিছুই অসার। ধীমান ব্যক্তি সার পদার্থের স্বরূপ অবগত হয়ে নিত্যপদ মোক্ষধাম প্রাপ্ত হয়। 'কালিকাপুরাণম্' – গ্রন্থে পুরাণকার লিখেছেন –

"সারং তত্ত্বং পরমং নিষ্ফলং য –
ন্মুর্ত্ত্যা হীনং মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম এষঃ।
সারোহন্যোহসৌ সারহীনং তদন্যজ্
জ্ঞাত্বৈবে থং যাতি নিত্যং মহাধীঃ।।"[৬]

'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'য় ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে কর্ম করার উপদেশ দিয়েছেন। কারণ কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য কর্মই প্রধান উপায়। যথার্থ আত্মজ্ঞানের অধিকারী হলে তবেই মানুষ পাপপুণ্য থেকে মুক্তিলাভ করতে পারেন। আত্মজ্ঞান দ্বারা মুক্তিলাভে সমর্থ না হলে মানুষ যোগ অবলম্বন করে সংসারের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন। 'শ্রীমদভগবদ্গীতা'র দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪০ সংখ্যক শ্লোকে সংসার ভয় থেকে মুক্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে–

"নেহাভিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।"[৭]

শ্মশানে প্রিয়জনে আর শ্মশানবন্ধুরা মিলে তাদের এতদিনকার প্রিয় মানুষটিকে সহজে স্বর্গলোকে যাত্রার পথ সুগম করার জন্য দেবতার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করেন। দেশে দেশে, কালে কালে সমাজ ও ধর্ম ব্যবস্থার ভিন্নতা অনুসারে মৃত মানুষের সৎকারের বিধি ব্যবস্থায় পার্থক্য সূচিত হয়। হিন্দুরা মৃতদেহকে আগুনে দাহ করেন। হিন্দু বৈষ্ণবেরা 'সমাজ' (সমাধিস্থ) দেন। মিশরে ফারাওদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া আজও জগৎ বিখ্যাত হয়ে আছে। মুসলমানেরা মৃতদেহকে কবর দেন। একালে হিন্দু সমাজে শববাহক এবং সৎকার কার্যে যারা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকেন, তাদের বলা হয় 'কাঁধকেট্যা'।

গঙ্গাতীরই শ্মশানভূমির উপযুক্ত স্থান। পুণ্যতোয়া গঙ্গার স্পর্শে মানুষ পাপ মুক্ত হয়ে স্বর্গগমন করেন। হিন্দুপুরাণের অনেক স্থান পবিত্র গঙ্গার মাহাত্ম্য কথায় পরিপূর্ণ। ধর্মপ্রাণ হিন্দুর কাছে গঙ্গা স্বর্গ গমনের পবিত্র পথ। হিন্দুরা গঙ্গাতীরেই মৃত্যুকামনা করেন। 'দেবীভাগবতম্' পুরাণে উল্লিখিত আছে, যে কোন পাপ এমনকি ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হলেও এমনকি গঙ্গা স্নানে বিনষ্ট হয় –

"কোটিজন্মার্জ্জিতং পাপং ভারতে যৎ কৃতং নৃভিঃ।
গঙ্গায়া বাতস্পর্শেন নশ্যতীত শ্রুতৌ শ্রুতম্।।"[৮]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 100
Website: https://tirj.org.in, Page No. 883 - 901
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভারতবর্ষের সমস্ত স্থানে গঙ্গা প্রবাহিত হয় না। সুতরাং গ্রাম গঞ্জের প্রান্তিক স্থানে শ্মশানের জায়গা নির্দিষ্ট করা হয়। তবে প্রবাহিত গঙ্গাতীরের প্রায় সর্বত্রই রয়েছে শ্মশানভূমি।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদ-এ অর্থাৎ 'নবম পরিচ্ছেদ' (প্রেতভূমে) শ্মশানের বর্ণনা আছে। সেই শ্মশান অবস্থিত রয়েছে গঙ্গাতীরের এক বৃহৎ সৈকতভূমিতে। শ্মশানভূমির মুখ গঙ্গা সম্মুখীন। মনুষ্য বর্জিত এমন নির্জন স্থানে শ্মশান ভীষণ অতিপ্রাকৃত রূপ পরিগ্রহ করে। শ্মশান শবভুক পশুদের বিচরণ ক্ষেত্র। এখানে পশুদের কর্কশকণ্ঠের ধ্বনি শোনা যায়। শ্মশানের স্থানে স্থানে ভাঙা শ্মশান কলস, মৃতের খুলি অস্থি প্রভৃতি বিচ্ছিন্নভাবে পড়ে থাকে। এই শ্মশানকে হিন্দুরা দেবভূমির তুল্য মনে করলেও, বাস্তবে তার কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। কমলকুমার মজুমদারের 'অন্তর্জলী যাত্রা' উপন্যাসের পটভূমি গঙ্গাতীরবর্তী এক মহাশ্মশান। এই শ্মশানেই সংসার রচনা করেছিলেন মুমূর্ষু সীতারাম ও তরুণী যশোবতী। এই শ্মশানেই স্বর্গ-নরকের সাংসারিক আলোআঁধারি রূপ দেখেছিলেন চণ্ডাল বৈজুনাথ। বৈজুনাথ শ্মশান রক্ষক। এখানেই আছে পঞ্চমুণ্ডীর ঘাট। এ ঘাট বড় পুণ্যের ঘাট। সতেরো-আঠারো-উনিশ শতকের অভিশপ্ত সতীদাহ প্রথার নির্মম চিত্র শিল্পবন্দি করতে গিয়ে কমলকুমার হিন্দুমিথের অবয়বে এমন আদর্শ শ্মশানের চিত্র উপস্থাপিত করেছেন। উপন্যাসটি ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র পরিচালিত সমাজ ব্যবস্থার প্রতি এক সচেতন অঙ্গুলি নির্দেশ। কমলকুমার 'অন্তর্জলী যাত্রা' উপন্যাসের শেষ অংশে চণ্ডাল বৈজুনাথ ও যশোবতীর কথোপকথন প্রসঙ্গে লিখেছেন –

> "চণ্ডাল ...আমাকে কেন ভয় দেখাচ্ছ?"
>
> "ভয় দেখাব কেনে, বউ দেখাই, সিন্দুর মাঙ্গি, এ শ্মশানে আর আমি পাব কোথাকে? এ শ্মশানে এক সিদ্ধ ছিল, মেয়েদের চুলের পৈতা ছিল, এক কঙ্কালকে 'ওগো ভৈরবী গিন্নী' বলে ডাকত যে হে..." যশোবতীর চর্ম্ম লোল, জিহ্বা শুষ্ক হইয়াছিল। নরমুণ্ডের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি অনাদি অনন্তকালের দৃশ্য দেখিয়াছিলেন।"[৯]

দুই

"শূদ্রাদায়োগবঃ ক্ষত্তা চাণ্ডালশ্চাধমো নৃণাম্
বৈশ্যরাজন্যবিপ্রাসু জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ।"[১০]

শূদ্র পুরুষের ঔরসে ব্রাহ্মণজাতীয়া নারীর গর্ভজাত সন্তানকে চণ্ডাল বলা হয়। এইভাবে যে সব বর্ণসংকর জন্মগ্রহণ করেন, তার মধ্যে চণ্ডালেরাই হলেন মনুষ্য জাতির সবথেকে অধম। একথা লিখেছেন মহর্ষি মনু তাঁর 'মনুসংহিতা' গ্রন্থে। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র নিম্নবর্গীয় শূদ্র তো বটেই, রমণীকেও কখনোই সামাজিক মর্যাদার মান্যতা ফিরিয়ে দিতে চায়নি।

ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র চণ্ডালদের বাসস্থান নির্দিষ্ট করেছেন গ্রামের বাইরে, বৃক্ষতলে (চৈত্যবৃক্ষে) বা শ্মশানে অথবা পাহাড়ের কাছে বা উপবনে।

"চৈত্যদ্রুমশ্মশানেষু শৈলেষুপবনেষু চ।
বসেয়ুরেতে বিজ্ঞানা বর্তয়ন্তঃ স্বকর্মভিঃ।।"[১১]

কুকুর এদের সঙ্গী। পরিত্যক্ত ভাঙা পাত্রে এরা খাদ্য গ্রহণ করেন। মৃত ব্যক্তির কাপড়-চোপড় এদের আচ্ছাদন। এদের জীবিকা মৃতদেহ সৎকার করা। বান্ধবশূন্য বা অনাথ শবকে চণ্ডালেরাই সৎকার করেন। মনু তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন –

"অবান্ধবং শবঞ্চৈব নির্হরেয়ুরিতি স্থিতিঃ।"[১২]

কি করেছে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র? নারীর জন্য সতীদাহ। আর শূদ্র বা চণ্ডালের জন্য শ্মশানভূমি। প্রাচীনকাল থেকে শবদেহ সৎকার ও শ্মশান রক্ষক রূপে চিহ্নিত হয়ে রইলেন চণ্ডালেরা।

H.H. Risley (1851 – 1911) তাঁর 'The Tribes and Castes of Bengal' (1891) গ্রন্থে লিখেছেন –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 100
Website: https://tirj.org.in, Page No. 883 - 901
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "The Chandals of Bengal in variably call themselves Nama – Sudra, and with characteristic jealousy the higher divisions of the name Chandal to the lower, who in their turn pass it on to the DOM."[১৩]

প্রাচীন ভারতবর্ষে নারী এবং শূদ্র – সমাজে এদের অবস্থানই ছিল সবথেকে খারাপ। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের প্রসারিত তীক্ষ্ণ নখরে বিদ্ধ হয়েছিল এরা। বৈদিক যুগেও দাস ব্যবস্থা ছিল। 'ঋগ্বেদ সংহিতা'য় তার সাক্ষ্য মেলে –'শতং দাসা অতি স্রজঃ'[১৪] – অর্থাৎ আমাকে একশত দাস প্রদান কর।

হিন্দুরা মৃতদেহকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলেন। 'ঈশ উপনিষদ' – এ প্রাচীন ভারতীয় ঋষি এ প্রমাণ রেখে গেছেন। অর্থাৎ প্রাচীনকাল থেকে হিন্দুরা মৃতদেহকে দাহ করার রীতিকে মান্যতা দিয়ে এসেছেন। 'ঈশ উপনিষদ' – এর ১৭ সংখ্যক মন্ত্রে উল্লিখিত আছে, আমার প্রাণবায়ু নিত্যকালস্থায়ী মহাবায়ুতে মিলিত হোক। তারপরে প্রাণহীন এই দেহ ভস্মে পরিণত হোক। বৈদিক যুগের ঋষির মৃত্যুকালীন এই প্রার্থনা গভীর দার্শনিক বোধের পরিচয় রেখে যায় –

"বায়ুরনিলমম্ তমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।"[১৫]

বৈষ্ণবেরা নানা আচারের মাধ্যম ভূমি খনন করে মৃতদেহ বসিয়ে মাটি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। 'ঋগ্বেদ সংহিতা'র ১০ মণ্ডলের ১৮ সূক্তের ৯ সংখ্যক ঋকে মৃতকে শ্মশানে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আবার উক্ত সূক্তের ১১ সংখ্যক ঋকে বলা হয়েছে, মাতা যেমন আঁচল দিয়ে সন্তানকে আচ্ছাদন করেন, তেমনি পৃথিবী মৃতদেহকে আপন ভূমি দিয়ে ঘিরে রেখেছে –

"মাতা পুত্রং যথা সিচাভ্যেনং ভূম ঊর্ণুহি।"[১৬]

সমাধিস্থ করার সময় অগ্নিকর্তা পৃথিবীমাতাকে প্রণাম করে মৃত ব্যক্তির জন্য তাঁর (দেবীর) কাছ থেকে সামান্য ভূমি চেয়ে নেন। বর্তমান বৈষ্ণবেরা যে মৃতদেহকে 'সমাজ' (সমাধিস্থ) করেন, তার প্রাচীন রূপ পাওয়া যাচ্ছে 'ঋগ্বেদ সংহিতা'য়। মহর্ষি মনু শূদ্রদের দাসরূপে চিহ্নিত করেছিলেন এবং তাঁর 'মনুসংহিতা'য় সাত প্রকার দাসের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও দাসের উল্লেখ আছে। দাসদের দ্বারা শব বহনের উল্লেখও আছে। কৌটিল্য তাঁর 'অর্থশাস্ত্রম্' গ্রন্থে লিখেছেন –

"প্রেতবিন্মূত্রোচ্ছিষ্টগ্রাহাণামাহিতস্য।"[১৭]

শব বহন, বিষ্ঠা, মূত্র ও উচ্ছিষ্ট অপসারণের কাজ নিম্নবর্গীয় শূদ্ররাই করতেন।

বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণের কালে মৃতদেহকে আগুনে দাহ করার প্রথা প্রচলিত ছিল। রাজা দশরথের ক্ষেত্রে সেই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেছিল। দশরথ পুত্র বিরহে দগ্ধ হয়েই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। মৃত্যুর পরে রাজার আত্মীয়স্বজন ও মিত্রেরা বিবেচনা করেছিলেন, পুত্র বিরহজনিত মৃত্যুর কারণে দাহ করা উপযুক্ত হবে না। শেষ পর্যন্ত রাজা দশরথের মৃতদেহ তৈলপূর্ণ দ্রোণীর মধ্যে সংরক্ষিত রাখা হয়েছিল। মহাকবি বাল্মীকি লিখেছেন –

"তৈলদ্রোণ্যাং শায়িতং তং সচিবৈস্তু নরাধিপম্
... ...
ঋতে তু পুত্রাদ্দহনং মহীপতে
র্নারোচয়ংস্তে সুহৃদঃ সমাগতাঃ।
ইতীব তস্মিন্ শয়নে ন্যবেশয়ম্
বিচিন্ত্য রাজানমচিন্ত্যদর্শনম্
গতপ্রভা দ্যৌরিব ভাস্করং বিনা
ব্যপেতনক্ষত্রগণেব শর্ব্বরী।।"[১৮]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 100
Website: https://tirj.org.in, Page No. 883 - 901
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মহাভারতে মাদ্রীর 'সতী' হওয়া এবং পাণ্ডু ও মাদ্রীর দাহকার্যের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। মাদ্রীর শিবিকারোহণের, পরে ছত্র, চামর, বস্ত্র, পুষ্প প্রভৃতি সহযোগে সজ্জিত চিতায় পাণ্ডুর সঙ্গেই অনুমৃতা হয়েছিলেন তিনি। পাণ্ডুর মৃত্যুর পরে গঙ্গায় তর্পণ করেছিলেন ভীষ্ম বিদুর সহ আত্মীয় স্বজনেরা। মহাভারতকার লিখেছেন, পুরোহিতের অনুমতিক্রমে চিতা প্রদক্ষিণ করে মাদ্রীর সঙ্গে পাণ্ডুর শরীর দগ্ধ হয়ে গেল –

"যাজকৈরভ্যনুজ্ঞাতে প্রেতকর্ম্মণ্যনুষ্ঠিতে।
ঘৃতাবসিক্তং রাজানং সহ মাদ্র্যা স্বলঙ্কৃতম্।।
তুঙ্গপদ্মকমিশ্রেণ চন্দনেন সুগন্ধিনা।
অন্যৈশ্চ বিবিধৈর্গন্ধৈর্বিধিনা সমদাহয়ন্।।"[১৯]

ঋষি বিশ্বামিত্রের অভিশাপে রাজা হরিশ্চন্দ্র চণ্ডাল রাজের আজ্ঞাবাহী হয়েছিলেন। কাশীর মহাশ্মশানের দক্ষিণাংশ রক্ষার দায়িত্ব তিনি পেয়েছিলেন। 'দেবীভাগবতম্' পুরাণগ্রন্থে সেই শ্মশানের বর্ণনা রয়েছে। হরিশ্চন্দ্র মৃতব্যক্তির বস্ত্র সংগ্রহ করতেন। শবের মালায় পরিপূর্ণ ছিল সে শ্মশান। অতি দুর্গন্ধময়। চিতার ধোঁয়ায় শ্মশানক্ষেত্র ভীষণ হয়ে উঠত। অসংখ্য শৃগাল-কুকুর-শকুনি প্রভৃতি পশুপাখি নিরন্তর দলে দলে শবমাংস ভক্ষণ করতেন। গলিত শবের পূতিগন্ধে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত থাকত। শ্মশানের সর্বত্রই নরকঙ্কাল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে থাকত। স্থানে স্থানে অর্ধদগ্ধ শবমুণ্ড, বিকৃত দন্ত শ্মশানভূমির যত্রতত্র পড়ে। ভীষণ চিতাগ্নির চটচট ধ্বনি। শ্মশান ক্ষেত্রের চারধারে শত শত শৃগাল, ভূত-প্রেত, পিশাচ ও ডাকিনী এবং নিশাচরেরা দলে দলে বিকট শব্দ করে ঘোরে। শ্মশানের সর্বত্র ছোট ছোট কলস, শববস্ত্র, ছিন্ন শবের কেশ। এছাড়া নিশাচরদের ভোজনের আনন্দ। কিন্তু শ্মশানের এমন রূপই চরম নয়। হরিশ্চন্দ্র-শৈবার পুত্রের অপমৃত্যু হয়েছে। পুত্রের মৃত্যুর মতো তীব্রতর দুঃখ ও দহন পৃথিবীতে আর কিছুই নাই। জীবন যখন এমন নশ্বর, তখন সত্যধর্ম অবলম্বনই শ্রেয়। রাজা হরিশ্চন্দ্র শবের বস্ত্র পরিধান করে সেই দুর্গন্ধময় ভীষণ শ্মশানক্ষেত্রে যাত্রা করেছিলেন। 'দেবীভাগবতম্' পুরাণে উল্লিখিত আছে –

"কস্মিংশ্চিদথ কালে তু মৃতচৈলাপহারকঃ।
হরিশ্চন্দ্রোহভবদ্রাজা শ্মশানে তদ্বশানুগঃ।।
চাণ্ডালেনানুশিষ্টস্তু মৃতচৈলাপহারিনা।
রাজা তেন সমাদিষ্টো জগাম শবমন্দিরম্।।
পূর্য্যাস্তু দক্ষিণে দেশে বিদ্যমানং ভয়ানকম্।
শবমাল্যশমাকীর্ণং দুর্গন্ধবহুধূমকম্।।"[২০]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' গ্রন্থের 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ঃ' – এর ৫০ সংখ্যক পদটিতে মানুষের মৃত্যুর পরে আগুনে দাহ করার রূপকে নির্বাণ প্রাপ্তির কথা ব্যক্ত হয়েছে। শবরপাদ নির্বেদ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁর চেতনা লুপ্ত হয়েছে। তিনি নির্বিকল্প অবস্থায় রয়েছেন। তাঁর শবরত্বের অবসান ঘটে গেছে। ঐ দেখ, সেই শবর নির্বাণ লাভ করেছেন। পদকর্তা লিখেছেন –

"চারি বাসে গড়িলারেঁ দিআঁ চঞ্চালী
তঁহি তোলি শবরোডাহকত্রলা কান্দই সগুণশিআলী
মারিল ভবমত্তা রে দহ দিহে দিধলিবলী।"[২১]

ছত্রটির অভিধানগত অর্থ লৌকিক শ্মশান চিত্রের পটভূমিকে রূপায়িত করেছে। বাঁশের চাঁচড় দিয়ে মৃতদেহ রাখার চারপায়া খাট নির্মাণ করা হল। সেই খাটে শবদেহ শায়িত আছেন। এরপর দাহকর্ম সম্পন্ন করা হল। পদটির অভিপ্রায়গত অর্থ বৌদ্ধ দর্শনের নির্বাণতত্ত্বের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে। কিন্তু পদটির লৌকিক তাৎপর্য উপেক্ষণীয় নয়। আজ থেকে হাজার এগারোশ বছর আগে, সেই প্রাচীন বাংলায় বাঙালিদের সৎকারের রীতিই ছিল মৃতদেহকে বাঁশের খাটিয়ায় করে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 100
Website: https://tirj.org.in, Page No. 883 - 901
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

শ্মশানে নিয়ে যাওয়া। চিতায় একের পর এক কাঠ সাজিয়ে আশ্চর্য শিল্পিত রূপ দেওয়া হত। তারপর মৃতদেহকে চিতার উপর রেখে কাঠের সজ্জাসহ দাহ করা হয়। মাংসভুক শৃগাল শকুনি কাঁদতেন কেন? তাদের আহার্য বস্তু তাদের সামনেই আগুন গ্রাস করে নিচ্ছে। সুতরাং শৃগাল শকুনের কান্না স্বাভাবিক। শবরকে দাহ করার কথা পদকর্তা এখানে বলেন নি ঠিকই, কিন্তু শ্মশানের রূপকে নিভৃত নির্বাণ পথের সিঁড়ি রচনা করলেন পদকর্তা। জীবন-মৃত্যুর বাস্তবমুখী এই ছায়াপথ স্বর্গ পথের সিঁড়ি রচনা করল। স্বর্গ হিন্দুদের কাছে চির বসন্তের দেশ।

বাংলার বর্ণবিন্যাস ও জনতত্ত্ব অনুসারে চণ্ডালেরা ব্রাহ্মণেতর জাতি। নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' (আদিপর্ব) গ্রন্থে লিখেছেন – চণ্ডালেরাই সমাজের নিম্নতম স্তর –

"চণ্ডাল ও অন্ত্যজ এই দুই-ই সমার্থক।"[২২]

চর্যাপদে ডোম বা ডোম্ব, চণ্ডাল, শবর, কাপালি প্রভৃতি নিম্নবর্গীয় জাতির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। চর্যার ১০ সংখ্যক পদে ডোম (ডোম্বি) রমণীর উল্লেখ করেছেন পদকর্তা কাহ্নুপাদ। এই রমণীকে ছুঁতে নেই, কারণ তিনি নিম্নবর্গীয়, অন্ত্যজ ও অচ্ছুত। এই নারীকে স্পর্শ করলেই ব্রাহ্মণ তথা সাধারণ মানুষও অপবিত্র হয়ে যায়। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের প্রতিনিধিরা অস্পৃশ্য ডোম সম্প্রদায়কে নগরের মধ্যে স্থান দেননি। সেকারণে নগরের বাইরে গ্রামের প্রান্তসীমায় কুঁড়েঘরে তিনি বসবাস করেন, তিনি চাঙাড়ি বিক্রি করেন। কাহ্নুপাদ এই নারীর জন্যই হাড়ের মালা পরেছেন। মহাসুখ লাভ করতে চেয়েছেন। পদকর্তা লিখেছেন –

"নগরবাহিরি রে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।"[২৩]

চর্যাপদে ডোম্বিনী নারীর মত 'মাতঙ্গি' অর্থাৎ চণ্ডালী রমণীর উল্লেখ আছে। ১৪ সংখ্যক চর্যার উল্লিখিত হয়েছে–

"গঙ্গা জউনা মাঝেঁরে বহই নাঈ।
তহিঁ বুড়িলী মাতঙ্গী পোইআ লীলে পার করেই।।
বাহতু ডোম্বী বাহ লো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা।।"[২৪]

নদীতে নৌকা চলাচলের ছবি। মাতঙ্গী ডোম্বীর নৌকায় নদী পারাপারের রূপকে যোগসাধনার মাধ্যমে ভবনদী উত্তীর্ণ হওয়ার তাৎপর্য মেলে। চর্যার ১৯ সংখ্যক পদে বলা হয়েছে, কাহ্নপাদ নিম্নবর্গীয় ডোম্বিনীকে যৌতুকের জন্য বিবাহ করে নিজের জাতি বিসর্জন দিয়েছেন –

"কাহ্ন ডোম্বীবিবাহে চলিআ
ডোম্বী বিবাহিআ আহরিউ জাম
জউতুকে কিঅ আণুতু ধাম।"[২৫]

'বৃহদ্ধর্ম্মপুরানম্' গ্রন্থে আনুমানিক দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক সময়কালীন বাংলাদেশের জাতি বিভাগের পরিচয় দিয়েছেন পুরাণকার। নিম্নবর্গীয় শূদ্রদের মধ্যে সবচেয়ে হীন জাতিরূপে পুরাণকার অন্ত্যজ বা অধম সংকর জাতির উল্লেখ করেছেন। ৩৬ টি জাতি প্রাচীন ভারতবর্ষে বর্ণাশ্রম বহিষ্কৃত জাতিরূপে চিহ্নিত হত। এই শ্রেণীর নিম্নবর্গীয় জাতি হল চণ্ডাল। পুরাণকার চণ্ডাল জাতিকে সংকর - অধম জাতি বলে চিহ্নিত করেছেন –

"ধীবরাদপি শূদ্রায়াং মত্তজাতির্বভূব হ।
ইত্যাদি যেহন্ত্যজাঃ প্রোক্তা বর্ণাশ্রমবহিষ্কৃতাঃ।।
তে চোক্তা মধ্যমা বিপ্র অধমাঃ সঙ্করান্তরম্।
সঙ্করান্তরসম্ভূতাঃ সচণ্ডালমনাদয়ঃ।।"[২৬]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 100
Website: https://tirj.org.in, Page No. 883 - 901
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বড়ু চণ্ডীদাস তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' কাব্যে কবি কৃষ্ণকে 'চাণ্ডাল' বলে অভিহিত করেছেন। 'দানখণ্ড' - এ কবি লিখেছেন –

"চাণ্ডাল কাহ্নাঞিঁ এবেঁ বল করে।"[২৭]

অনুরূপে 'বাণখণ্ড' - এ কৃষ্ণের কার্যাবলীকে চণ্ডালের সঙ্গে তুলনা করেছেন কবি। সমকালের ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রও চণ্ডালকে সামাজিক অস্পৃশ্যতা ও ভীতিকর জীব বলে দেগে দিয়েছিলেন –

"হেন রাধা মারিলেঁ চাণ্ডাল চক্রপাণী।"[২৮]

সমগ্র প্রাচীন যুগ ও মধ্যযুগ জুড়ে অধম সংকর চণ্ডাল তো বটেই, এককথায় সমগ্র নিম্নবর্গীয় শূদ্রদের পরিচালক এবং নিয়ন্ত্রক ছিলেন ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র। এঁরাই ছিলেন শূদ্রদের 'হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা'। যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী শ্মশানের মধ্যে সমাজবর্জিত ও সাধারণ মনুষ্যবর্জিত হয়ে, চিতার আগুনে পেষণে পেষণে হৃদয় ও মানবিক বোধগুলো যখন ছিঁড়ে খুঁড়ে পুড়ে যায়, তখন আর অবশিষ্ট কি থাকে? ক্রোধ, অবদমন এবং ঘৃণা। যা তারা শতাব্দীর পর শতাব্দী পেয়ে এসেছে, তাই তারাও ফিরিয়ে দিয়েছে কখনো সখনো, সময়ে সময়ে সসম্মানে। সমাজ তাদের ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই দিলে না। যুগসঞ্চিত ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের পাপকে বহন করতে করতে চণ্ডাল সম্প্রদায় হয়ে উঠেছিলেন ক্লান্ত, অসহায়। বেদের যুগে নিম্নবর্গীয় শূদ্রদের আর্যরা কোন মর্যাদাই দিতেন না। চণ্ডালেরা শতাব্দীর পর শতাব্দী বংশপরম্পরায় ভারবহনকারী পশুর মতই জীবন ধারণ করেছেন। বৃত্তি নির্বাচনের স্বাধীনতাও এদের ছিল না। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র চণ্ডালের ক্ষেত্রে অত্যন্ত নির্মম। মানবিকতা, আবেগ অনুভূতির সামান্যতম ব্যাকরণকেও এঁরা শাসন করেছে নির্মম চাবুক দিয়ে। বৈদিক পরবর্তী যুগে মহর্ষি মনুর সৃষ্ট পথই হয়ে ওঠে ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের পথ ও পাথেয়। রামায়ণের কালে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পেরিয়ে ক্ষত্রিয় রাজাদের কোন কাজই স্বাধীনভাবে করার উপায় ছিল না। এমনকি দশরথ পুত্র মহাকবি বাল্মীকির মহাকাব্যের নায়ক রাজা রামচন্দ্রেরও নয়। রামচন্দ্র যে শূদ্র নৃপতি শম্বুককে অযৌক্তিক, বিবেকবর্জিত ও বিবেচনাহীনভাবে হত্যা করেছিলেন তাও ছিল সমকালীন ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের কুশলী পরামর্শ।

সন্তানসম্ভবা পত্নী সীতাদেবীকে অরণ্যে পরিত্যাগ করার মধ্যেও ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সুবিস্তৃত প্রসারিত হস্তের দীর্ঘ ছায়া প্রলম্বিত রয়েছে। রামচন্দ্রের এসব কাজ ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের অনুমোদিত হলেও তাঁর চরিত্র গৌরব বৃদ্ধি করেনি। শূদ্রজাতি যে তিমিরে ছিলেন, সেই তিমিরেই রয়ে গেছেন। ভারতবর্ষে দৃপ্ত আর্যসভ্যতা পদদলিত করে গেছে অন্ত্যজ অস্পৃশ্য অনার্যদের। মহাভারতের যুগেও নিম্নবর্গীয় অনার্য অস্পৃশ্যদের কোন নিশ্চয়তা ছিল না। একথা ঠিক, ভারতবর্ষীয় সমাজ কর্ণের প্রকৃত পরিচয় জানতেন না। তাঁকে সারথীর পুত্র বলেই জেনেছিলেন। তাই বীর্যবত্তার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র ও ক্ষত্রিয় সমাজ তাঁকে একযোগে প্রতিহত করে সমাজ কাঠামোর বাইরে রাখতে চেয়েছিলেন। রাজ পরিমণ্ডলের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশের তাঁর কোন অধিকার ছিলনা। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র তাড়িত কর্ণের নির্মম পরিণতি কে না জানে? এরপর সৃষ্টি হল পুরাণ। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র হল পুরাণ। মহর্ষি মনু নিম্নবর্গীয় মানুষের জন্য যে মৃতযুগের কারাগার তৈরি করেছিলেন, পুরাণকারেরা আচার আর সংস্কারের বেড়াজালে কয়েক শতাব্দী জুড়ে ভারতীয় সমাজকে উপহার দিয়েছে কঙ্কালের স্তূপ। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র সমগ্র মধ্যযুগ জুড়ে শূদ্র এবং নারী নিধনের তপস্যা করেছিল। মন্ত্রতন্ত্র এবং অলৌকিক আচারের সাধনায় ব্রাহ্মণ্য প্রতিনিধিরা নিজেদের দেবতার সমপর্যায়ে তুলে ধরেছেন। নারীর জন্য সতীদাহ আর চণ্ডালের জন্য দুর্গম বীভৎস শ্মশান ক্ষেত্র। এমন আবহ নির্মাণ ছিল সমগ্র প্রাচীন ও মধ্যযুগ জুড়ে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের দান। হিন্দুশাস্ত্রে চণ্ডালকে স্পর্শ করা, চণ্ডাল স্পর্শদোষ জনিত জল পান, চণ্ডালের অন্নভোজন, চণ্ডালের নিকট থেকে ধন গ্রহণ, চণ্ডালী গমন প্রভৃতি কারণে সুনিশ্চিত প্রায়শ্চিত্ত বিধির পালনীয় উপদেশ দিয়েছেন শাস্ত্রকারেরা। শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য তাঁর 'স্মৃতিচিন্তামণিঃ' নামের হিন্দু শাস্ত্রে এমনই অনেক শ্লোকে চণ্ডাল সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রায়শ্চিত্ত বিধানের উল্লেখ করেছেন –

"যস্তু চাণ্ডালসংস্পৃষ্টং পিবেত্তোয়মকামতঃ।
স তু সান্তপনং কৃচ্ছ্রং চরেৎ শুদ্ধ্যর্থমাত্মনঃ।।"[২৯]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 100
Website: https://tirj.org.in, Page No. 883 - 901
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

না জেনে চণ্ডাল স্পর্শজনিত জল পানে প্রায়শ্চিত্ত হবে, কিন্তু জেনে পান করলে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত হবে। মধ্যযুগের সমাজপতিরা এইসব পুরাণ এবং স্মৃতিশাস্ত্রকে আপনাদের দেবোত্তর সম্পত্তি বলেই মনে করতেন। আর এসব গ্রন্থগুলিকে লোকসমাজের মুখচ্ছদ হিসেবে তুলে ধরে সমস্ত সমাজদেহকে কলুষিত আচারে পূর্ণ করে ফেলেছিলেন। মানবতা ঢাকা পড়েছিল পূতিগন্ধময় সামাজিক কুপ্রথার অন্তরালে। হিন্দুশাস্ত্রের মুক্তিমোক্ষের চাদরে ঢাকা পড়েছিল শতাব্দী লাঞ্ছিত নিম্নবর্গীয় শূদ্রদের ক্রন্দন। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের কঠিন পেষণে চণ্ডাল প্রভৃতি নিম্নবর্গীয় শূদ্ররা মানবেতর জীবন যাপন করেছিল। ভারতবর্ষে জাতি এবং বৃত্তিকে এক করে দেখা হয়েছে। নিম্নবর্গীয় শূদ্র সম্প্রদায়ের বৃত্তি অর্থাৎ জীবিকা উত্তরাধিকার ও ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত। অস্পৃশ্য মানুষের বৃত্তিমুখরতা প্রাচীন ও মধ্যযুগের সমগ্র সমাজদেহকে পুষ্ট করলেও তা তাদের গৌরবান্বিত করেনি। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বহমান ঘৃণা তাদের মানুষ হিসাবে কোন মর্যাদাই দেয়নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কালান্তর' প্রবন্ধ গ্রন্থের 'শূদ্রধর্ম' প্রবন্ধে লিখেছেন –

> "শূদ্রও যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করেছে, কিন্তু সমাদর পায় নি। তবুও, সে কিছু পাক আর না পাক, ধর্মের খাতিরে হীনতা স্বীকার করার মধ্যেও তার একটা আত্মপ্রসাদ আছে।"[৩০]

এমন রবীন্দ্রকথিত 'আত্মপ্রসাদ' শূদ্রের মর্যাদাবোধ ফিরিয়ে দেয় নি। যুগ যুগ ধরে লাঞ্ছিত হতে হতে, তাদের হৃদয়বৃত্তি শুকোতে শুকোতে, তারা যে নিষ্প্রাণ পাথরে পরিণত হচ্ছিল সে কথাতো অস্বীকার করা যাবে না। রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন শূদ্রত্বে শূদ্রের কোন অসন্তোষ নেই।

ভারতবর্ষ শূদ্রধর্মের দেশ। তবুও মনে হয়, রবীন্দ্রকথিত শূদ্রত্বভার কোন সম্পদ নয়। একথা ঠিক, এমন সম্পদকে রক্ষা করার মধ্যেও কোন গৌরব নেই। প্রবন্ধটিতে শূদ্র সম্পর্কে রবীন্দ্র চিন্তন নানা প্রশ্নের জন্ম দেয়। তবুও রবীন্দ্রনাথের শূদ্র সম্পর্কিত কিছু মূল্যবান মন্তব্য ধীমান পাঠক-সমালোচকের দৃষ্টি এড়াবে না।

> "ধর্মশাসনে পুরুষানুক্রমে যাদের চাকর বানিয়েছে তাদের মতো চাকর পৃথিবীতে কোথায় পাওয়া যাবে। ...আজ যদি তারা বিদেশী শিক্ষায় মাঝে মাঝে আত্মবিস্মৃত হয় তবে সমাজপতি তাদের স্পর্ধা সম্বন্ধে আক্রোশ প্রকাশ করে।"[৩১]

বাংলা সাহিত্যে অনাথ শবের সন্ধান দিয়েছেন অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'দেবদাস' উপন্যাসে। দেবদাস মুখোপাধ্যায়। কুলীন জমিদার ব্রাহ্মণ। পার্বতীর শ্বশুরালয় হাতীপোতার জমিদার ভুবনবাবুর বাড়ির সম্মুখে দেবদাসের মৃতদেহ। দেবদাস হয়ে উঠেছেন অজ্ঞাত পরিচয় শব। কে দাহ করবে তাঁকে? কে ছোঁবে? কি তাঁর জাত? জাতিভেদ জর্জর পল্লিগ্রামের লোকসমাজে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। শরৎচন্দ্র এই অনাথ শব দেবদাস সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা বড় বেদনার –

> "ব্রাহ্মণের মৃতদেহ হইলেও, পাড়াগাঁয়ে কেহ স্পর্শ করিতে চাহিল না, কাজেই চণ্ডাল আসিয়া বাঁধিয়া লইয়া গেল। তার পর কোন শুষ্ক পুষ্করিণীর তটে অর্ধদগ্ধ করিয়া ফেলিয়া দিল – কাক শকুন উপরে আসিয়া বসিল, শৃগাল-কুক্কুর শবদেহ লইয়া কলহ করিতে প্রবৃত্ত হইল। ...বলিতে বলিতে পার্বতী ছুটিয়া নামিয়া পড়িল। মহেন্দ্র হতবুদ্ধি হইয়া কহিল, ওমা, কোথা যাও? দেবদার কাছে। সে ত আর নেই-ডোমে নিয়ে গেছে।"[৩২]

তারপর পার্বতী মূর্ছিত হলেন। মূর্ছা ভঙ্গ হলে তিনি বললেন, রাত্রিতে এসেছিলেন। সমস্ত রাত। তারপর তিনি চুপ করে গেলেন। এরপর পার্বতী কেমন ছিলেন আমরা জানি না। তাঁর কোন খবর পাওয়া যায় না। সামান্য কয়েক লাইনেই লেখক চণ্ডাল তথা ডোমেদের দ্বারা অনাথ শব সৎকারের ছোট চিত্রে উপন্যাসের কথাবস্তুকে অসামান্য করে তুললেন।

'অন্তর্জলী যাত্রা' উপন্যাসে বৈজু শ্মশান চণ্ডাল। লেখকের কলমে বৈজু সময়ে সময়ে 'বৈজুনাথ' হয়ে উঠেছেন। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র অবশ্য উপন্যাসে এই শ্মশান চণ্ডালকে কখনো সম্মান সূচক সম্বোধন করেন নি। শ্মশানে শবদাহের সময় বৈজুর হাতে থাকে লাঠি। সমাজে বৈজু তার অবস্থান সম্পর্কে সচেতন। নিজের সম্পর্কে সে বলেছে–

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 100
Website: https://tirj.org.in, Page No. 883 - 901
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"আমি জাতচাঁড়াল গো, আমি তারাগুলা জলে দেখি আমার মাস শেয়াল শকুনে খায় না গো!"[৩৩]

শ্মশানে মড়া দেখে দেখে বৈজু অর্জন করেছিল একরাশ ক্লান্তি – জীবনের ক্লান্তি। চিতার আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে বৈজু বলেছে –

"মড়া দেখি দেখি আমি মাটি হইছি গো, আমি তো শব গো, বহুদিন মরে আছি হে।"[৩৪]

বৈজু নীচ কুলোদ্ভব। সে অস্পৃশ্য। শ্মশানে জ্যোতিষী তাকে অভিশাপ দিয়েছে –

"ফের বেটা হারামজাদা চাঁড়াল! বড় বাড় বেড়েছে তোর... খড়ম পেটা করে আমি তোর নাম ভুলিয়ে দেবো... ছোট জাত। ...পাষণ্ড, বেটা তুই কুকুর হয়ে জন্মাবি।"[৩৫]

শ্মশানে কখনো সখনো রমণীকে পুড়িয়ে মারা হয় অর্থাৎ সতীদাহ হয়, সতী স্বর্গে গমন করেন। পুণ্যবতী নারী। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের প্রতিনিধি জ্যোতিষী অনন্তহরি বৈজুর উদ্দেশ্যে বলেছেন –

"তুই শালা চাঁড়াল, বামুন কায়েতের সতী, এর ছায়া মাড়াবি না।"[৩৬]

চণ্ডাল বৈজুনাথ চিতা সাজানোয় পারদর্শী। চিতা সাজানো হিন্দু সংস্কৃতির অন্তর্গত। 'অন্তর্জলী যাত্রা' উপন্যাসে বৈজু চিতা সাজানোর শুরুতে জমিকে প্রণাম করেছেন। চিতার মাপ নিয়েছেন। হামাগুড়ি দিয়ে হাত মেপে মেপে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন। খুঁটি বসিয়েছেন। হাওয়ার গতি নির্ণয় করেছেন। গঙ্গার দিক নির্ণয় করেছেন। চিতার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ বিচার করেছেন। সমগ্র উপন্যাসে বৈজুনাথ ঘৃণিত ছোটজাত তকমা নিয়েই কাটিয়েছে। উপন্যাসে তার মুক্তি নেই। তার হাঁটা চলা সভ্য মানুষের মত হলেও তাকে অপরাধী বলে চিহ্নিত করা হবে –

"বেটা তুই পাতকুড়নোর অধম ছোট জাত, ...হাঁটছিস আমাদের মত।"[৩৭]

বৈজুনাথ শ্মশান পরিচর্যাকারী। তার নিজস্ব কোন স্বাধীনতা নেই। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র নির্দেশিত পথেই সে চলতে অভ্যস্ত। তবুও সে ভূত নয়, প্রেত নয়। এই শ্মশান চণ্ডালের মধ্য দিয়েই লেখক উপন্যাসে দুর্গন্ধ পীড়িত কদর্য সমাজভূমিতে মানবিকতার বিশুদ্ধ হাওয়া সঞ্চালিত করেছেন। শ্মশানের চণ্ডাল হওয়ার জন্য বৈজুনাথের কোনদিন কোন ভয়ডর ছিল না। ভয় কি সে কোনদিন জানে না। এই গঙ্গা তীরবর্তী মহাশ্মশানে সে একাকী। তার ভয় নেই। তার মনে হয় সে ভূত, প্রেত, চণ্ডাল কিংবা চিতা। গঙ্গার স্রোত তার সঙ্গে কথা বলে। উপন্যাসে এই চণ্ডাল বৈজু হয়ে ওঠে 'ডাকাত' নাম চিহ্নিত। শ্মশানে মৃতদেহকে সৎকারে সাহায্য করাই তার কাজ। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র তাকে কোথাও মর্যাদা দেয় নি। প্রায়ই তাদের সমবেত উচ্চারণ–

"হারামজাদা ... বেল্লিক ... শালা চাঁড়াল।" [৩৭.ক]

কমলকুমার মজুমদারের 'অন্তর্জলী যাত্রা' উপন্যাসটি যেন শ্মশানের অলৌকিক মৃতপ্রায় ব্যাধিভারে পীড়িত। উপন্যাসটি মধ্যযুগের। যা সেই পঙ্কিল যুগকে স্মরণ করায়। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র নির্দেশিত শ্মশানের সামগ্রিক রূপটি এখানে প্রতিফলিত। শ্মশানে চলমান হিন্দু মিথকে পূর্ণরূপে সাহিত্যলগ্ন করেছেন লেখক। উপন্যাসে রয়েছে শ্মশান, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র, হিন্দু রীতি ও সংস্কার, মোক্ষ বা মুক্তি, কামনা, মৃত্যুকালীন গঙ্গাজল পান, নারায়ণ শিলা পূজা, গীতা পাঠ, শ্মশান কীর্তন, কীর্তনের দল, হরিনাম সংকীর্তন, হিন্দু জ্যোতিষী, ও জ্যোতিষ গণনা, হিন্দুশাস্ত্র অনুসারী চিতা, দাহকর্ম, পিণ্ড দান, শ্মশান কলস প্রভৃতি। এছাড়া পুরাণ উদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোক পাঠ, সতীদাহ, পঞ্চমুণ্ডীর ঘাট, প্রেতলোক, গঙ্গায় ডুবে মরণের অভিলাষ, হিন্দু অলৌকিকতা, কৌলীন্য প্রথা, মানব জীবনে মঙ্গল-রাহু-বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহের প্রভাব, দুর্গা নাম জপ, শ্মশান সঙ্গীত, শ্মশান বাদ্য, মহাভারতের মাদ্রীর উল্লেখ, মহর্ষি মনু নির্দেশিত জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা, চিতা সাজানো, কন্যা সম্প্রদান, প্রায়শ্চিত্ত, তর্পণ, সতী মাহাত্ম্য, দশমহাবিদ্যা, মহাভারতের মাদ্রী মাহাত্ম্য, ত্রিতাপহারিণী গঙ্গা, শিব-দুর্গা, ভূত-প্রেত, জন্মান্তর, পুনর্জন্ম, শবযাত্রী, তুলসী গাছ, মনুসংহিতা, সপ্তর্ষি মণ্ডল, শ্মশানের অশরীরী রহস্য প্রভৃতির বাস্তব চিত্রকর কমলকুমার।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 100
Website: https://tirj.org.in, Page No. 883 - 901
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের নির্দেশিত নিয়মের বেড়াজালে যুগ যুগ ধরে লাঞ্ছিত, পদদলিত নিম্নবর্গীয় চণ্ডাল প্রতিনিধি বৈজুনাথের মুখে ভাষা দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। মানুষের মৃতদেহ সৎকার করতে করতে জীবন মৃত্যু সম্পর্কে আত্মদর্শন লাভ করেছেন বৈজুনাথ। জীবন যন্ত্রণা তাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। অভিজ্ঞতা থেকে তার বোধের উন্মেষ হয়েছে। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র যেখানে অমানবিক, অপরিণত শ্মশান চণ্ডাল বৈজুর সেখানে ঘটে গেছে মানবিক উত্তরণ। শতশত শতাব্দীর পচনশীল সমাজদেহে যেখানে সংস্কারের নিশ্ছিদ্র সুবৃহৎ দেওয়াল তুলেছিল ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র, সেই দেওয়ালের ফাটলে ফাটলে ঋতুরাজ বসন্ত ঋতুর মৃদুমন্দ হাওয়া প্রবেশ করেছিল শ্মশান চণ্ডাল বৈজুনাথের মত বিবেকী মানবিক সংবেদী চরিত্রের মধ্য দিয়ে। শ্মশান চণ্ডাল বৈজুনাথ বাংলা সাহিত্যের ব্যতিক্রমী সৃষ্টি।

নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবন দর্শনের প্রকাশ ঘটেছে শ্মশান সঙ্গীতে। এসব সঙ্গীতে মানব জীবনের অসারতা প্রতিফলিত। ধর্মপ্রাণ হিন্দুর মোক্ষ ও মুক্তির অভীপ্সা ব্যাকুলতা ব্যক্ত হয়েছে এখানে। সহজ কথায়, সরল সুরে নিম্নবর্গীয় লোকসমাজের কীর্তন শিল্পীরা (সঙ্গীত শিল্পী) হিন্দু দর্শনের সারতত্ত্বকে প্রকাশ করেছেন সঙ্গীতে। ছোট ছোট উপলব্ধি, লৌকিক অভিজ্ঞতা ও বাস্তব চিত্রের মেল বন্ধনে চমৎকার নিরাসক্ত রূপ লাভ করেছে নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবন দর্শন। কোন গানে স্বল্পস্থায়ী মানবজীবনকে 'দোকানদারির' সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কোন গানে হাসি কান্নায় ভরা এই দু'দিনের ঘরে আত্মীয়জনের সাময়িক বিষণ্ণতা প্রতিফলিত। জীবন থেমে থাকে না। অনিবার্য মৃত্যু এসে তাকে নিয়ে যায়। ছোটো ছোটো লোকজীবনে মৃত্যুর বিরাটত্বের সুর প্রতিফলিত। এ জীবন আমাদের ফেলে যেতে হবে। রেখে যেতে হবে সাধের ঘরবাড়ি। কিন্তু চিতার আগুনে সব পুড়ে যায়। বিষণ্ণ বেদনা শ্মশানভূমির ধূম থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে আকাশ-বাতাস ও মহাকাশকে ছুঁয়ে ফেলতে চায়।

শ্মশান সঙ্গীত জীবনকে পরিত্যাগ করে নয়। মানব জীবনের শৈশবের জল খেলা, যৌবনের প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা, স্ত্রী-পুত্র পরিজন নিয়ে ঘর-সংসার এভাবে একদিন বার্ধক্য আসে। দাঁত নড়ে। লাঠিতে (নড়িতে) ভর করে চলে জীবন। সমাজ সংসারের কাজ কমে যায়। বার্ধক্য মানুষকে জঞ্জালসম করে তোলে। অবশেষে একদিন আসে সেই সে দিন। যে দিন শ্মশান যাত্রার দিন। ঘর বাড়ি সংসার তুচ্ছ হয়ে যায়।

স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-পরিজন, ঘর-সংসার, জমি-বাড়ি, পুকুর-ঘাট, উঠোন বাগানের এই চেনা চৌহদ্দি জন্ম দেয় গভীর আসক্তির। লোকজীবনের পরিমণ্ডলে এই আসক্তি থেকে মুক্তি পাওয়া দুরূহ। সংসার আসক্ত মানুষের এমন মুক্তি সত্য সত্যই কঠিন। সংসারের সীমানায় থেকে ইচ্ছে থাকলেও তা হয়ে ওঠে না। চিতার আগুনে পুড়ে পুড়ে মৃত্যু ধৌত মানুষ নতুন জন্ম নেয়। আসক্তির স্বাভাবিক অবসান ঘটে। তখন কোথায় পড়ে থাকে তার সাধের ঘর দুয়ার, টাকা-কড়ি, হাল-লাঙল জোয়াল। সংসারের জন্য জমি চষতে চষতে তার নিজের হৃদয়বৃত্তির জমিই অনুর্বর থেকে যায়। সাড়ে তিন হাত ভূমির ভেতরেই ইহ জগতের দেনা-পাওনা সবই চুকে যায়। গাছের জল শুকিয়ে যাওয়ার চিত্রকল্পে হই জীবনের নিরর্থকতা ফুটিয়ে তোলেন গায়ক কীর্তনীয়া। শ্মশান সঙ্গীত হয়ে ওঠে মৃত ব্যক্তির আত্ম-প্রতিরূপ। কোথায় পড়ে থাকে যশ-কীর্তি-খ্যাতি। গঙ্গা জল স্পর্শ করে ঈশ্বরের পায়ে সমর্পণের মধ্য দিয়ে স্বর্গ পথের দরজা উন্মুক্ত করে দেন লোককবি –

"ঐ দোলা খাটে শ্মশান ঘাটে
এই সেদিন যাবে চলে হেলে দুলে
মরে গেলে এ মানুষ মরে গেলে
ঐ দোলা খাটে শ্মশান ঘাটে
পড়ে রবে জায়গা জমি টাকা কড়ি পয়সা দালান বাড়ি
মরে গেলে বলবে মড়া ডুব দেবে সবাই ছুঁলে
মরে গেলে এ মানুষ মরে গেলে
ঐ দোলা খাটে শ্মশান ঘাটে
যাবে চলে হেলে দুলে
নাগর দোল দিয়ে সেদিন সাজাবে তোরে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 100
Website: https://tirj.org.in, Page No. 883 - 901
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সোনার দেহ ঢেকে দেবে সাদা কাপড়ে
সেদিন বিধি মতে বংশধরে দেবে মুখেতে আগুন জ্বেলে
মরে গেলে মানুষ মরে গেলে
এই জন্মিলে মরিতে হবে বিজয় ধীবর বলে
একে একে যাবে সবাই
আপন দেশে চলে
বাজিবে করতাল আর খোল
বিদায় দেবে বল হরি বোলে।”[৩৮]

অপর একটি গানে রয়েছে শ্মশান যাত্রার ছবি। চারজনের কাঁধে ভর করে মৃত মানুষটি শ্মশানে যাচ্ছে। কেউ ঝাড়ে বাঁশ কাটছেন, কেউ বা দড়ি পাকাচ্ছেন। আর ব্যক্তিটি এ জীবনের সব দেনাপাওনা, লাভালাভ ও জীবনের হিসেব নিকেশ চুকিয়ে পাড়ি দিচ্ছেন অজানা স্বর্গলোকের পথে। মৃতের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় লোককবি গেয়ে ওঠেন –

“কেহ কাটে ঝাড়ের বাঁশ
কেউ বা পাকায় দড়ি
চারজনাতে কান্ধে কইর‍্যা বলবে হরি হরি
রইলো রে তোর সাধের দোকানদারি (ঘরবাড়ি)
... ...
কত কষ্ট কইর‍্যারে মন
গইড়্যাছ ঘরবাড়ি
আগুনে পুড়িবে না মাথা
মারবে বাঁশের বাড়ি।
রইলো রে তোর সাধের দোকানদারি।।”[৩৯]

কোন গানে নশ্বর জীবনের প্রতি বীতরাগ ফুটে উঠেছে। মৃত্যুর পরে লোকাচার পালনের মধ্যে প্রিয়জনকে এড়িয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা আছে। আত্মীয় স্বজনের অবজ্ঞা জীবন পরবর্তী ধূসর মৃত্যুর মুখকে মেদুর, ছায়াময় ও করুণ রঙীন করে তোলে। লোককবি দেহকে মাটির দেহ বলেছেন। যে দেহ মাটিতেই বিলীন হবে। এই পবিত্র দেহ তুচ্ছার্থে হয়ে ওঠে ‘পচাদেহ’। এই দেহের যথার্থ কোন গৌরব নেই। মাটি দিয়ে কুমোর যেমন ঠাকুরের মূর্তি তৈরি করেন তেমনি ঈশ্বর রক্ত মাংসের মানুষ সৃষ্টি করেছেন। জীবনের পরে মৃত্যুই হল মানুষের শেষ বিছানা। জ্বলন্ত চিতার সামনে লোককবি গেয়ে ওঠেন–

“ও তোর মাটির দেহ মাটি হবে
পুড়ে হবে ছাই
এ দেহ পচা দেহ গরব কিসের ভাই
হাড় মাটিতে কুমোর যেমন ঠাকুর গড়ে
রক্ত মাংসে দয়াল তেমন মানুষ গড়ে
শ্মশান হবে শেষ বিছানা রব ঘুমায়ে
খাঁচা পড়ে রবে পাখি যাবে পালিয়ে।”[৪০]

কোন গানে লোককবি বলেছেন, জীবনের অনেক সময় বৃথা অপব্যয় হয়েছে –

“ও মনো রে কার লাইগ্যা বান্ধ ঘর বাড়ি।”[৪১]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 100
Website: https://tirj.org.in, Page No. 883 - 901
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সুতরাং ঈশ্বরের কাছে আত্ম সমর্পণ করে মুক্তি খোঁজেন কবি।

কোন গানে জীবনের অন্তিম সময়ে কৃষ্ণনাম শ্রবণের কথা আছে। মানুষ তাঁর অন্তিম শয্যার জন্য অপেক্ষা করেন। এই অন্তিম শয্যা হল সাড়ে তিন হাত ভূমির ভিতর নির্মিত ঘর। কবি বলেন –

"ও মন ময়না রে ...
এসেছো মন এই মাটিতে যেতে হবে এই মাটিতে
সাড়ে তিন হাত ভূমির ভিতর হবে যে তোর ঘর।।
... ...
ধান চাল টাকা কড়ি সবই কিছু রইবে কড়ি
শেষের দিনে এই হরিনাম হবে রে সম্বল
দিন বয়ে যায় কৃষ্ণ কথা বল।"[৪২]

কোন গানে কবি হইজীবনের ব্যর্থতার কথা বলেছেন। সুতরাং পরকালের জন্য ভাববার কোন অবকাশ পান নি শ্মশানযাত্রী মানুষটি। বসত করার জন্য ঘর বানালেন, কিন্তু চাল ছাইতে পারলেন না। যে চাল কোন এক উপপ্লবে উড়ে গেছে। গাছ লাগালেন ফলের আশায়, কিন্তু জল সেচন করতে পারলেন না। গাছের ডাল শুকিয়ে ঝরে গেল। হাল লাঙল করে পরের জমি কর্ষণ করলেন, কিন্তু নিজের জমি বেহাল হয়ে গেল। এখন মৃত্যুর নদী পেরিয়ে ঈশ্বরের কৃপার উপর ভর করে ভবপারে পৌঁছানোর চেষ্টা ছাড়া উপায় কি? কবি লিখলেন –

"আশা কইর‍্যা গাছ লাগাইলাম ফল পাব বলে
জল দিতে পারলাম না আমি
শুকাইয়া গেল গাছের ডাল
গেল না আমার দুঃখের কপাল
হাল দিলাম লাঙল দিলাম জমি দিলাম চষে
পরের জমি চষতে চষতে নিজের জমি হয় বেহাল।"[৪৩]

অপর একটি গানে হরিনাম নিয়েই শ্মশান ঘাটে যেতে চান সংসারবদ্ধ মানুষটি। শ্মশানযাত্রী ব্যক্তিটির ঘর-বাড়ি আত্মীয় স্বজন সবই পড়ে থাকে। ইহজীবনে তো সংসারের আগুনে জ্বলে পুড়ে মরেছেন। চিতার ধোঁয়ায় মান অভিমান সবই পুড়ে যায়। লোককবি লিখলেন –

"আমি হেলে দু'লে যাব শ্মশান ঘাটে
... ...
এই মান অভিমান পুড়বে সাথি
চিতার ধোঁয়াতে।"[৪৪]

এমন শেষের দিনে খোল করতাল সহযোগে হরিনামই কেবল সঙ্গী হবে। মৃত্যুর দিনে টাকা-পয়সা, গয়না গাঠি কিছুই সঙ্গে যায় না। দেহ যেদিন মাটি হবে, সেদিন সাড়ে তিন হাত জমির বেশি আর কিছুই দেবে না। মাটিতে শায়িত করার জন্য এইটুকু ভূমি মাত্র। লোককবি লিখলেন –

"সাড়ে তিন হাত জমির বেশি আর কিছুই দেবে না
সোনাদানা গয়না গাঠি একদিন হবে মাটি
একটুকরো কাপড়ও কেউ অঙ্গে দেবে না।"[৪৫]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 100
Website: https://tirj.org.in, Page No. 883 - 901
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কবে মানুষ প্রথম সম্মানের সঙ্গে তাদের প্রিয়জনকে প্রথম সৎকার করেছে, আমরা জানি না। আদিম মানুষ বর্বর অবস্থা কাটিয়ে পরিশীলিত হয়েছে। যথার্থ মানুষ হওয়ার চেষ্টা করেছে সেই প্রাচীনকালে। মানুষ মানুষ হওয়ার সাধনা করেছে। কিন্তু সে সাধনা আজও সম্পূর্ণ হয়নি। কবে যে মানুষ পরিপূর্ণ মানুষ হবে আমরা জানি না। মানুষের মানুষ হওয়ার অগ্রগমনের পথে কোন এক ধাপে আপনজনের মৃত্যুর পর মৃতদেহকে সম্মানের সঙ্গে নির্দিষ্ট স্থানে মানুষ সৎকার করেছে। পালন করেছে আচার ও রীতি-নীতি। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এক এক জাতি তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি অনুযায়ী মৃতদেহ সৎকার করেছে। প্রাচীন মিশরে ফ্যারাওদের মমি বড় বিস্ময়। ফ্যারাওদের নির্মিত সমাধিস্তম্ভ 'পিরামিড' মানব সংস্কৃতির বিরাটত্বকে প্রকাশ করেছে। মুসলমান সম্প্রদায় মৃত্যুর পরে মৃতদেহকে সম্মানের সঙ্গে কবর দেন। পত্নী মমতাজের মৃত্যুতে সম্রাট সাজাহানের নির্মিত সমাধি মন্দির 'তাজমহল' আজও সমস্ত মানবজাতির সৌন্দর্যের বিস্ময়কর স্মারক। হিন্দুদের মৃতদেহ সৎকার করা হয় শ্মশানে। এই শ্মশান হিন্দুদের কাছে পরম পবিত্র স্থান। হিন্দু জাতির বহু শতাব্দীর ধর্মীয়-আধ্যাত্মিক ও আচার আচরণগত পরিশীলনের চিহ্নিত ছাপ থেকে গেছে শ্মশানে মৃতদেহ সৎকারের মধ্যে। হিন্দুর মিথ-মোক্ষ-মুক্তি-দেববাদ, জীবন-মৃত্যু কেন্দ্রিক দার্শনিকতা, শ্মশান রক্ষক ও সঞ্চালক, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র, প্রথা ও আচার-আচরণ, সংস্কার-বিশ্বাস, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য, আত্মা ও পুনর্জন্ম, জীবনের গূঢ় রহস্য ও অসীমতা সবই যেন শ্মশানের কয়েক বর্গফুট ভূমির মধ্যে ক্রিয়াশীল। শ্মশান সঙ্গীত হিন্দু সংস্কৃতির নশ্বরতাবোধক মোক্ষ মুক্তির গান। মানব জীবনের চাওয়া-পাওয়া, লাভ-লোভ, হিংসা-বিদ্বেষ সবই চিতার আগুনে লীন হয়ে যায়। চিতা বিশিষ্ট লোকশিল্প সৌন্দর্যের স্মারক।

এই শতাব্দীতে কেমন আছেন সেই শ্মশান চণ্ডালেরা? না - তারা ভাল নেই। অনেক নিম্নবর্গীয় জাতির বৃত্তি হারানোর মতো শ্মশান চণ্ডাল বা ডোমেরাও তাদের বৃত্তি হারিয়েছে। বৃত্তি হারানোর সময়ে তাদের সঞ্চয় বলতে কিছুই ছিল না। না ছিল সঞ্চিত কিছু টাকা কড়ি, না ছিল এক প্রস্থ ভূমি, না ছিল জীবিকা অর্জনের জন্য সভ্য মানুষের মত বেঁচে থাকার সামান্য কিছু অর্জিত শিক্ষা দীক্ষা। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র আকাশ বাতাস জল স্থলের কণামাত্রও চণ্ডালদের জন্য রাখেন নি। তারা নিজেদের মধ্যে দখল ও বিলিবণ্টন করে নিয়েছে। হিন্দুর চিতা কাঠের স্থান নিয়েছে বৈদ্যুতিক চুল্লি। চণ্ডাল বা ডোমের স্থান নিয়েছে মৃতের আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-পড়শি পরিজনেরা। সেই শৈল্পিক চিতা কিংবা আলো-আঁধারি রহস্যময় ভয়ঙ্কর ঐশী শক্তি সম্পন্ন শ্মশানের ধারণা আজ আর নেই। চণ্ডালেরা বৃত্তিচ্যুত হলেও সমাজ তাদের পরিপূরক বৃত্তির কোন ব্যবস্থা করেন নি। বরং এই নিম্নবর্গীয় জনগোষ্ঠী ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র নির্দেশিত শতাব্দী সঞ্চিত অস্পৃশ্যতার ভার বহন করে চলেছে আজও। কি করছে চণ্ডালেরা? এরা অনেকেই গ্রামে-গঞ্জে ভিক্ষাবৃত্তি করে। অনেকেই হাওড়া বা শিয়ালদহ স্টেশনে কিংবা কলকাতার ফুটপাতে ফুটপাতে ভিক্ষাবৃত্তি করে। অনেকেই যক্ষারোগাক্রান্ত বা কুষ্ঠরোগী। অনেকে কলে কারখানায় বা ফুটপাতের ধারে ধারে নর্দমায় ময়লা পরিষ্কার করে অস্বাস্থ্যকর জীবন কাটায়। স্টেশন কিংবা খোলা আকাশের তলে শীতের রাতে এদের সংসার। কেউ কাগজের টুকরো কুড়োয়, কেউ পরিত্যক্ত মৃত মানুষের কম্বল জড়িয়ে শীত নিবারণ করে। এদের দেখার কেউ নেই। ধনতান্ত্রিক সমাজে কোন সৎ মানুষ বলে কিছু হয় না। আর ধনতান্ত্রিক সমাজে সব মানুষের শ্মশান যাত্রা এবং স্বর্গযাত্রার চলন বলনও এক রকম হয় না। তবুও 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'য় ভগবান কৃষ্ণ সমস্ত মানুষের জন্য একই রকম উপদেশ দিয়েছেন। বলেছেন, আত্মা কখনো জন্মগ্রহণ করেন না অথবা মৃত হন না। কিংবা পুনরায় উৎপন্নও হন না। আত্মা জন্মশূন্য, শাশ্বত ও প্রাচীন। দেহ বিনষ্ট হলেও আত্মা অবিনাশী –

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বান ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।।"[৪৬]

জাত-জর্জরিত বাংলাদেশে 'ছোটজাত' দুলের মেয়ে অভাগীরও মৃত্যুর পরে স্বর্গ যাত্রার ইচ্ছে হয়। শরৎচন্দ্রের 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে সঙ্গতিসম্পন্ন ঠাকুরদাস মুখুয্যের স্ত্রীর মৃত্যুর পরে 'ধূমধামের শবযাত্রা' দেখতে ভিড় জমে যায়। গ্রামের গরুড় নদীর তীরে শ্মশান। চন্দন কাঠের চিতা, (তুলনীয়, রবীন্দ্রনাথের 'দেনাপাওনা' গল্প) ঘৃত-ধূপধুনো-মধুতে পরিপূর্ণ চিতা সংলগ্ন শ্মশানভূমি। প্রজ্বলিত চিতার নীলধোঁয়া রথের মত উর্দ্ধমুখী হয়ে আকাশ ছেয়ে ফেলে। মুখুজ্যের মৃত পত্নীর সিঁথিতে সিঁদুর, পা দু'টি আলতায় রাঙানো। এ যেন মৃত ব্রাহ্মণ পত্নীর রথে চড়ে স্বর্গ যাত্রার ছবি। এ সংসারে অভাগীরা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 100
Website: https://tirj.org.in, Page No. 883 - 901
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বেশি দিন বাঁচে না। মৃত্যুর পরে চিতা সাজানোর প্রয়োজনে তাঁর নিজের হাতে পোঁতা গাছটা জমিদার কাটতে দেয় নি। ব্রাহ্মণ জমিদার মৃতদেহকে নদীর চড়ায় পুঁতে ফেলার পরামর্শ দিয়েছেন। ভট্টাচার্য মশায় বলেছেন –

> "তোদের জেতে কে কবে আবার পোড়ায় রে? ...তার পরে সকলে মিলিয়া মাটি চাপা দিয়া কাঙালীর মায়ের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া দিল। ...পোড়া খড়ের আঁটি হইতে স্বল্প ধোঁয়াটুকু ঘুরিয়া ঘুরিয়া আকাশে উঠিতেছিল।"[৪৭]

এই হল বাংলার নিম্নবর্গীয় দুলে-বাগদিদের মৃত্যুর পরে স্বর্গগমনের ছবি।

বাংলার শ্মশানগুলির বর্তমান অবস্থা কেমন? শ্মশান বা দেবতা স্থান সর্বসাধারণের সম্পত্তি। অত্যন্ত পবিত্র ভূমি। কিন্তু বর্তমান গবেষক দেখেছেন, দেবোত্তর স্থান, শ্মশান বা গ্রামীণ হাট-বাজারকে সেকালের জমিদার বা গ্রামের ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক মাতব্বরেরা সর্বসাধারণের অগোচরে নিজেদের নামে লিখে রেখেছেন। ফলে পরবর্তীকালে গ্রাম্য মোড়লদের উত্তরাধিকারীরা এসব সম্পদ কাগজের বলে নিজেরাই আত্মস্মাৎ করে নিচ্ছেন – এ রকম দৃষ্টান্ত বিরল নয়। শ্মশান সংলগ্ন ভূমিকে এরা কেটে কেটে সংকীর্ণ করে ফেলেছে। এগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণ করার মত প্রাচীনকালের চণ্ডালরাজ আজ আর নেই। হিন্দুর পবিত্র শ্মশানভূমি বর্তমানে হয়ে উঠেছে মল, মূত্র ও আবর্জনা ফেলার স্থান। শ্মশান আজ জঙ্গল, আগাছা ও ঝোপ ঝাড়ে পরিপূর্ণ। আজও ভারতীয় সমাজদেহ তালুবন্দি হয়ে রয়েছে সতীদাহ প্রথা প্রবর্তনকারী ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের উত্তর - পুরুষের কাছে।

শরৎ সাহিত্যের স্থানে স্থানে এসেছে শ্মশানের নানা চিত্র। লেখকের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে গঙ্গা নদীতে মাছ চুরি করতে গিয়ে ইন্দ্রের শ্মশান সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা বড় বিচিত্র। নদীর ধারে প্রাচীন বট গাছের পাশে যে মহাশ্মশান, সেখানে কলেরা বা মহামারী আক্রান্ত মৃতদেহকে সকলে পোড়াতে পারে না। একটুখানি আগুন ছুঁইয়ে দিয়ে চলে যায়। সেই শবকে শৃগালে কুকুরে ভক্ষণ করে। অবশিষ্ট অংশ পড়ে পড়ে পচতে থাকে। বাতাসে দুর্গন্ধ ছড়ায়। পড়ে থাকে অনেক অকালমৃত শব। গভীর নিশীথেও শোনা যায় শ্মশানচারী শৃগালের ক্ষুধার্ত কলহ-চীৎকার। বৃহৎ পক্ষীর পক্ষ-তাড়ন শব্দ। গঙ্গার তটে ভেসে আসা গৌর বর্ণ হৃষ্টপুষ্ট বালক। সনাতন হিন্দু সন্তানের পরিচয়হীন মৃতদেহ স্পর্শ করা পাপ। এই দেশ বশিষ্ঠের দেশ। বংশগত সংস্কার, জন্মগত সংস্কার আর জাতিচ্যুত হওয়ার ভয়। মৃত্যুকালে প্রায়শ্চিত্ত হয়েছিল কিনা, কোন জাতি তা নিশ্চিত হওয়া দরকার। অজাত-কুজাত ও অস্পৃশ্য মৃত দেহকে ছুঁতে নেই। উপন্যাসে শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথের সংলাপের মধ্যে ফুটে উঠেছে হিন্দু শ্মশানের ভয়াবহ চিত্র –

> "ইন্দ্র বলিল, মড়া। আজকাল ভয়ানক কলেরা হচ্ছে কিনা! ...কোনখানে ফেলে দিয়ে যায় ভাই? ঐ হোথা থেকে হেথা পর্যন্ত – সবটাই শ্মশান কিনা। যেখানে হোক ফেলে রেখে ঐ বটতলার ঘাটে চান করে বাড়ি চলে যায়, - আরে দূর! ভয় কি রে! ও শিয়ালে-শিয়ালে লড়াই করচে। ...শিয়ালে ছেঁড়াছিঁড়ি করে খাবে। ...হাঁ রে শ্রীকান্ত, মরলে মানুষ কি হয়, তুই জানিস? ...তারা সব স্বর্গে যায় ভাই! ...কহিল, সবাই ত স্বর্গে যেতে পায় না। তা ছাড়া খানিকক্ষণ সবাইকে এখানে থাকতে হয়।"[৪৮]

হ্যাঁ-একথা ঠিকই, সকলে স্বর্গে যেতে পারে না। মৃত্যুর পরে কেউ কেউ স্বর্গে যায়। কারো কারো মৃতদেহ শেয়ালে কুকুরে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। অসম সমাজ ব্যবস্থার এই দেশে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র বিশেষত নিম্নবর্গীয়দের জন্য এমন ব্যবস্থাই পাকা করে রেখেছে। বামুন-কায়েতের কথা থাক, মাছ চুরি বিদ্যায় অভ্যস্ত ইন্দ্রনাথ তবু বুঝেছিল - মড়া মড়াই – মড়ার কোন জাত নেই। আর 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'য় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ নিঃসৃত বাণী হল – মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্রগুলি ত্যাগ করে অন্য নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে, তেমনি আত্মা জীর্ণ দেহ সকল পরিত্যাগ করে অপর নতুন দেহ প্রাপ্ত হন -

> "বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোহপরাণি।
> তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।।"[৪৯]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 100
Website: https://tirj.org.in, Page No. 883 - 901
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের রচনায় শ্মশানের উল্লেখ রয়েছে। তরুণ রবীন্দ্রনাথ ১২৮৬ বঙ্গাব্দে (৯ই মার্চ, ১৮৮০) লিখেছেন 'বনফুল' কাব্যগ্রন্থটি। রবীন্দ্রনাথের প্রথম সম্পূর্ণ কাব্য এটি। কাব্যের রচনাকাল আরও চার বৎসর পূর্বের বলে মনে করা হচ্ছে। কাব্যের 'সপ্তম সর্গ' - এর সুদীর্ঘ কবিতাটির নাম 'শ্মশান'। কবির কবিতায় শ্মশানের ভীষণ রূপ প্রতিভাত। সেই নদী তীরবর্তী শ্মশান, যেন গম্ভীর প্রান্তর। শাখাপ্রশাখা হীন শুষ্ক বৃক্ষ সেখানে। পৃথিবীর ধ্বংসরাশি। প্রাণহীন শ্মশান যেন অন্ধকারে অস্থিভস্ম লুকিয়ে রেখেছে। মৃত মানব কঙ্কাল। ভূলুণ্ঠিত মৃতের দাঁত যেন পৃথিবীবাসীকে উপহাস করছে। শ্মশানের কোন স্থানে চিতা জ্বলছে। কোথাও ধূমরাশি। কোথাও শৃগাল শকুনের ক্রন্দন। সূর্যরশ্মি শুষ্ক ম্লান। তটিনী বিষণ্ণ গান শোনাচ্ছেন। কুমারী ঊষা, শ্মশান ভস্ম সেই পুরাতনী হিন্দু পুরাণকথাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে। ব্রাহ্মণ্য সংস্কার, সতীদাহ প্রথা – কবিতায় টুকরো টুকরো ঘটনাকে আশ্চর্য কাব্যরূপ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ–

"সেই সে বালিকা তোরে দেখিতাম বনে
চিতার অনলে আজ হবে তোর শেষ?
সুখের যৌবন হায় পোড়াবি আগুনে?
সুকুমার দেহ হবে ভস্ম-অবশেষে।"[৫০]

স্মৃতিচারী হয়ে ওঠেন রবীন্দ্রনাথ। তরুণীকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন তাঁর কিশোরী বেলায়। যেখানে সেই পাতার কুটির, সেখানে পত্রপল্লবের মর্মর ধ্বনি শোনা যায়। সেই সে বালিকা ফুল গাছে জল ঢালেন। আলো ছায়ার লুকোচুরি দোলা। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন –

"ভস্মরাশিসমাকুল শ্মশান প্রদেশ!
মলিনা কমলা ছাড়া যেদিকে নেহারি
বিশাল শ্মশানে নাই সৌন্দর্যের লেশ,
জন প্রাণী নাই আর কমলারে ছাড়ি।"[৫১]

রবীন্দ্রনাথের 'যাত্রী' গ্রন্থটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের জ্যেষ্ঠ মাসে। কবির 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি' অংশ ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ফাল্গুনের 'প্রবাসী'তে 'যাত্রী'র প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বালিদ্বীপে অবস্থানকালে সেখানে মানুষের মৃত্যুর পরে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার পরিচয় পেয়েছেন। বলিতে কোন পরিবারে বয়স্ক গুরুজন থাকা সত্ত্বেও যদি কমবয়সী কোন সদস্যের মৃত্যু হয়, তবে তাঁর মৃতদেহ সৎকার করা হত না। বড়োদের মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত মৃতদেহ সংরক্ষিত করা হত। পরে অনেকগুলি দেহের একসঙ্গে দাহকর্ম সম্পন্ন করা হত। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন –

"এখানে কয়েক বৎসর অন্তর বিশেষ বৎসর আসে, তখন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয়।"[৫২]

বালিতে শবদেহ বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য রথের মত বিশেষ যান প্রস্তুত করা হত। একে বলা হয় 'ওয়াদা'। এর গায়ে অঙ্কিত থাকত বড় গরুড়ের মুখ। এগুলি থাকত শিল্প সৌন্দর্যের নানা চিহ্ন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন–

> "শবাধার বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্যে রথের মতো যে একটা মস্ত উঁচু যান তৈরি হয়, অনেকসংখ্যক বাহকে মিলে সেটাকে চিতার কাছে নিয়ে যায়। এই বাহনকে বলে ওয়াদা। আমাদের দেশে ময়ূরপংখি যেমন ময়ূরের মূর্তি দিয়ে সজ্জিত, তেমনি এদের এই ওয়াদার গায়ে প্রকাণ্ড বড়ো একটি গরুড়ের মুখ।"[৫৩]

শ্মশানের সঙ্গে পুণ্যতোয়া গঙ্গার সম্পর্ক চিরকালই সুবিদিত। মৃত্যু – শ্মশানযাত্রা – মোক্ষ – মুক্তি হিন্দুর জীবনচর্যার অনিবার্য পরিণতি। হিন্দু গঙ্গাস্পর্শে ইহজগতের পাপ মুক্ত হয়ে স্বর্গলাভ করেন। শুধু তাই নয়, গঙ্গা ভারতীয় জাতি সত্তার সুবৃহৎ পরিচয়কে বহন করে। জীবন মৃত্যুর এমন ওঠাপড়ায় শ্মশান আর গঙ্গানদী কখনো পৃথক নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কালান্তর' গ্রন্থের 'বৃহত্তর ভারত' প্রবন্ধে লিখেছেন –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 100
Website: https://tirj.org.in, Page No. 883 - 901
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "গঙ্গানদী ভারতের একটি বৃহৎ পরিচয়কে বহন করে। ভারতের বহু দেশ বহু কাল ও বহু চিত্তের ঐক্যধারা তার স্রোতের মধ্যে বহমান। এই নদীর মধ্যে ভারতের একটি পরিচয়বাণী আছে। হিমাদ্রির স্কন্ধ থেকে পূর্বসমুদ্র পর্যন্ত লম্বমান এই গঙ্গানদী। যে যেন ভারতের যজ্ঞোপবীতের মতো, ভারতের বহুকালক্রমাগত জ্ঞানধর্মতপস্যার স্মৃতিযোগসূত্র।"[৫৪]

মাইকেল মধুসূদন দত্ত তার 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র 'শ্মশান' – কবিতায় বিষণ্ণতার সামসঙ্গীত পাঠককে উপহার দিলেন। শ্মশান ও মৃত্যু কবির কবিতায় হয়ে উঠল সমার্থক। মৃত্যুর স্থির সমুদ্রে জীবনের অর্জিত গৌরবরাশি বৃথা হয়ে যায়। সব যায় – বিদ্যা-বুদ্ধি-বল-মান-অর্থ সবই নিয়ে যায়। কবি লিখলেন –

"অর্থের গৌরব বৃথা হেথা – এ সদনে –
বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, মান, বিফল সকলে।
কি রাজা, কি প্রজা, হেথা উভয়ের গতি।
জীবনের স্রোতঃ পড়ে এ সাগরে আসি।
গহন কাননে বায়ু উড়ায় যেমতি।"[৫৫]

Reference:

১. বেদব্যাস, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, 'শিবপুরাণম', সম্পা. শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, শ্রাবণ, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫৮০ - ৫৮১
২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭৭
৩. তদেব
৪. বেদব্যাস, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, দেবী ভাগবতম্, সম্পা. শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, শ্রাবণ, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১০৫৫
৫. বেদব্যাস, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, কালিকাপুরাণম্, সম্পা. শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, কার্তিক ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪০৬
৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৫
৭. ব্রহ্ম, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত (সম্পা.), শ্রীমদ্ভগবদগীতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, ৪০ সংখ্যক শ্লোক, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারী ২০০৬, পৃ. ২২৫
৮. তর্করত্ন, আচার্য পঞ্চানন (সম্পা.), দেবীভাগবতম্, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪০১, পৃ. ৮৩৩
৯. মজুমদার, কমলকুমার, অন্তর্জলী যাত্রা, উপন্যাস সমগ্র কমলকুমার মজুমদার, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৭৪
১০. মহর্ষি মনু, মনুসংহিতা, দশম অধ্যায়, শ্লোক সংখ্যা ১২, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, পৃ. ১০১৩
১১. পূর্বোক্ত, দশম অধ্যায়, শ্লোক সংখ্যা – ৫০, পৃ. ১০২৭
১২. তদেব, দশম অধ্যায়, শ্লোক সংখ্যা – ৫৫, পৃ. ১০২৯
১৩. Risley, Herbert Hope, Tribes and Castes of Bengal, Vol. I., Printed at the Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1892, P. 184
১৪. দত্ত, রমেশ চন্দ্র (ভূমিকা), ঋগ্বেদ–সংহিতা, দ্বিতীয় খণ্ড, ৮ মণ্ডল, ৫৬ সূক্ত, ঋক্ সংখ্যা ৩, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ২৮০
১৫. সেন, অতুলচন্দ্র, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও মহেশচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত 'উপনিষদ' (অখণ্ড সংস্করণ), ঈশ উপনিষদ, শ্লোক সংখ্যা – ১৭, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা , ১৯৯৪, পৃ. ২৮

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 100
Website: https://tirj.org.in, Page No. 883 - 901
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১৬. দত্ত, রমেশ চন্দ্র (ভূমিকা),ঋগ্বেদ–সংহিতা, দ্বিতীয় খণ্ড, ১০ মণ্ডল, ১৮সূক্ত, ঋক সংখ্যা -১১, হরফ প্রকাশনী, ২০১৯, কলকাতা, পৃ. ৪৬৩
১৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক মানবেন্দু (সম্পা.), কৌটিলীয়ম অর্থশাস্ত্রম্, প্রথমখণ্ড, (৩.১৩.৩), সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ৬৮৫
১৮. মহর্ষি বাল্মীকি, রামায়ণম্, সম্পা. – শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন, বেনীমাধব শীলস্ লাইব্রেরী, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৩০০, ৩০১
১৯. বেদব্যাস, মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন, মহাভারতম্, আদিপর্ব-৩, সম্পা. শ্রীমদ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য, বিশ্ববানী প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৩৮৩, মাঘ, পৃ. ১৩৪৮
২০. তর্করত্ন, আচার্য পঞ্চানন (সম্পা.), দেবীভাগবতম্, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪০১, পৃ. ৬৭০ - ৬৭১
২১. শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ (সম্পা.), হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৪২৫, পৃ. ১৬৮ - ১৬৯
২২. রায়, নীহাররঞ্জন, বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ২২৯
২৩. শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ (সম্পা.), হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা, ১০ সংখ্যক চর্যা, বঙ্গীয় – সাহিত্য-পরিষদ, কলকাতা, ১৪২৫, পৃ. ১৪১
২৪. পূর্বোক্ত, ১৪ সংখ্যক পদ, পৃ. ১৪৪
২৫. পূর্বোক্ত, ১৯ সংখ্যক চর্যা, পৃ. ১৪৮
২৬. বেদব্যাস, শ্রীমহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, সম্পা. - আচার্য পঞ্চানন তর্করত্ন, উত্তর খন্ডম, ত্রয়োদশ অধ্যায়, নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, বৈশাখ, ১৩৯৬, পৃ. ৩৪০
২৭. বড়ু চন্ডীদাস, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, দানখণ্ড, সম্পা. - বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, বঙ্গীয় – সাহিত্য –পরিষদ, কলকাতা, ভাদ্র, ১৪২২, পৃ. ২০
২৮. পূর্বোক্ত, বাণখন্ড, পৃ. ১১১
২৯. ভট্টাচার্য, শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, স্মৃতি চিন্তামণিঃ, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪২৫, পৃ. ১৫৬
৩০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, শূদ্রধর্ম, কালান্তর, রবীন্দ্র– রচনাবলী (দ্বাদশ খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৌষ ১৪০২, পৃ. ৬১২
৩১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১৩
৩২. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, দেবদাস, শরৎ রচনা সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, কামিনী প্রকাশালয়, ১৯৯৬, পৃ. ৬৬ - ৬৭
৩৩. মজুমদার, কমলকুমার, অন্তর্জলী যাত্রা, কমলকুমার মজুমদার উপন্যাস সমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, জুন ২০২২, পৃ. ৯
৩৪. তদেব
৩৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫
৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫
৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩
৩৭. ক. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১
৩৮. ক্ষেত্র সমীক্ষায় প্রাপ্ত শ্মশান সঙ্গীত, তথ্য দাতা – মোহন সাঁতরা, গ্রাম – কমলপুর, পোস্ট – বাসুলিয়া, থানা – মহিষাদল, পূর্ব মেদিনীপুর, বয়স – ৬১, পেশা – কীর্তন, ৪৫ বৎসর ব্যাপী কীর্তন গানের সঙ্গে যুক্ত।
৩৯. তদেব
৪০. তদেব
৪১. তদেব
৪২. তদেব
৪৩. তদেব

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 100
Website: https://tirj.org.in, Page No. 883 - 901
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৪৪. তদেব
৪৫. তদেব
৪৬. ব্রহ্ম, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত (সম্পা.), শ্রীমদ্ভগবদগীতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২০ সংখ্যক শ্লোক, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারী, ২০০৬, পৃ. ১৬৪
৪৭. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, অভাগীর স্বর্গ, সুনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প, (সম্পা.), উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, মডেল পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ২৮৬
৪৮. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্ত (প্রথম পর্ব), শরৎ রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, তুলি কলম, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ৩৯৩ - ৩৯৬
৪৯. ব্রহ্ম, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত (সম্পা.), শ্রীমদ্ ভগবদগীতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২২ সংখ্যক শ্লোক, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারী, ২০০৬, পৃ. ১৭১
৫০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, শ্মশান, বন-ফুল, রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৪৯৭
৫১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯৯
৫২. পূর্বোক্ত, যাত্রী, জাভা যাত্রীর পত্র, পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি, রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড, পৃ. ৫৩০
৫৩. তদেব
৫৪. পূর্বোক্ত, বৃহত্তর ভারত, কালান্তর, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ৬১৫
৫৫. দত্ত, মধুসূদন, শ্মশান, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী, মধুসূদন ও দীনবন্ধু রচনাবলী, সম্পা. সব্যসাচী রায়, কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩৯৯, পৃ. ১৮৪